কনিষ্কের তিন দুয়ারী ঘর

অলোক রায়

যখন যন্ত্রণা, দৃশ্যের দর্পণে, নীলকণ্ঠ - কবি রাম বসুর (১৯২৫) এই কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচয় ছিল । তাঁর কয়েকটি কাব্যনাট্যও পড়েছি । কিন্তু তিনি যে কনিষ্ক ছদ্মনামে উপন্যাস লেখেন তা আমার জানা ছিল না । সম্ভবত ১৯৬৮ সালে মনোরঞ্জন মজুমদার মশায় তাঁর আনন্দধারা প্রকাশনের কতকগুলি বই আমাকে উপহার দেন । তার মধ্যে ছিল কনিষ্কের লেখা একটি উপন্যাস তিন দুয়ারী ঘর । মনোরঞ্জনবাবুই বলেন কনিষ্ক হল কবি রাম বসুর ছদ্মনাম । প্রায় তিরিশ বছর আগে উপন্যাসটি যখন পড়ি, তখন খুবই অভিভূত হয়েছিলুম । বাংলায় ঠিক এই ধরনের উপন্যাস আগে পড়েছি বলে মনেই পড়ে না । অবশ্য তিনের দশকে তথাকথিত মননপ্রধান উপন্যাসে বহুবিচিত্র জ্ঞান তথা তর্কবিতর্ক ভাষণ প্রতিভাষনের সমাবেশ হয়েছিল । বিশেষভাবে দিলীপকুমার রায়ের সেই সময় লেখা উপন্যাসের কথা মনে পড়বে । হয়তো পথ দেখিয়েছিল ইংরেজি উপন্যাস । রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি উপন্যাসের 'ইনটেলেকচুয়েল কসরত', দিলীপকুমারকে তিনি তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন অদ্ব্যর্থ ভাষায় , নভেলে কোন একজন মানুষকে ইনটেলেকচুয়েল প্রমান করতে হবে অথবা ইনটেলেকচুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপএ করে তোলা চাই , এমন কোন কথা নেই । গল্পের বইয়ে যাঁদের থীসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, সাহিত্যের পদ্মবনে তারা মস্ত হস্তী । (সাহিত্যের মাত্রা, ১৩৪০) । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা অমূলক ছিল । আলডাস হাক্সলির প্রভাব তেমন কার্যকর হয়নি । তারাশঙ্কর বিভূতিভূষন মানিক কিংবা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে ইনটেলেকচুয়েল নায়কের দেখা মেলেনি । অন্তত সে কাল থেকে একাল পর্যন্ত ভাবের সাহিত্যের দিকেই বাঙালি পাঠকের ঝোঁক প্রমাণিত হয়েছে । উপন্যাসের ঘটনার দুর্বারগতি এবং চরিত্রের অন্তরাকৃতি প্রশ্রয় পেয়েছে । ধূর্জটিপ্রসাদের খগেনবাবু বা অন্নদাশঙ্করের বাদল কোনদিনই বাংলা উপন্যাসের মূলধারাকে প্রভাবিত করতে পারেনি । দিলীপকুমারের উপন্যাস, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ, তা বহুদিন আগে বিলুপ্ত, অন্তত বিস্মৃত তো বটেই ।

সেদিক থেকে তিন দুয়ারী ঘর বাংলা উপন্যাস ধারায় নিশ্চয় ব্যতিক্রমী রচনার নিদর্শন । প্রায় তিনশো পাতার উপন্যাসে ঘটনা অতি সামান্য - সিংহানিয়া কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার একজিকিউটিভ অফিসার তিরিশ বছর বয়সি সমীর চক্রবর্তী অফিসের কাজে সম্বলপুর যাচ্ছিল, পথে হঠাৎ নিশির ডাকের মতো কার ডাকে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে এক ছোট ফ্লাগ ষ্টেশন বড়াবাম্বোতে, সেখানে দেখা হয় শৈশবের শিক্ষিকা আইভি ব্যারেটের সঙ্গে, তারপর তিনদিন সমীর আন্টি আইভির আহ্বানে চক্রধরপুরের কাছে ডিহিবিজরি গ্রামে থেকে যায় । এখানেও অনেক চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে না - জোহান আর তার বৌ মরিয়ম ("এদের জীবনের গোপনে কি আছে কে জানে ।"- জানবার চেষ্টা করেননি ঔপন্যাসিক) পশ্চাৎপটেই থেকে যায়, সামনে আসে শুধু ক্মিণী স্বামীনাথন, কিন্তু তাকে নিয়ে ও যতটা কবিত্বের উৎসাহ, রেখাভাসে তাকে ততটা স্পষ্ট করা হয়নি । কনিষ্কের কবি পরিচয় ক্মিনীর বর্ণনাতেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে -

ওর চুলের ভিজে গন্ধ, খোঁপার জড়ানো ফুলের বিহ্বল সুবাস, শাড়ির মৃদু আন্দোলন, মাটির ওপর পায়ের মসৃণ চাপ, অবলোকিত দৃষ্টি , ওর অস্তিত্বের সর্বস্বতা নিয়ে ও যখন আমার পাশ দিয়ে চলে গেল - স্বপ্নের মতো, সংগীতের মতো, শ

ান্ত দুরাশার মতো , অবিরল স্তব্ধতার শীর্ষে গির্জার ঘন্টা ধবনির মতো - আমি চেতন অচেতনের গোধূলি সীমায় সম্মো হিত গাছের মতো একবার তন্দ্রা-স্বরে ভেঙে পড়তে গিয়ে মুক হয়ে গেলাম ।

এর সঙ্গে আছে সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার এক ইংরেজ তণী এমিলির জার্নাল। এমিলির জার্নাল ইতিহাস ও কল্পনা মিশিয়ে কনিষ্কের রচনা। আইভি ব্যারেট সমীরকে এমিলির জার্নাল পড়তে দেওয়ার সময় বলেছেন— "একশ' বছরেরও আগের কথা। কাগজ নষ্ট হয়েছিল। আমি আবার কপি করেছি। এটা আমি মায়ের সূত্রে পেয়েছি। এমিলিয়া হর্ন-এর নাম শুনেছ? সিপাই বিদ্রোহের সময় বুঝলে সমীর। সিপাই বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালের লেখা। এমিলিয়া হর্ন এটি দিয়েছিল আম ার মাকে। আমার মা দিল আমাকে। ... আমি যার ডাইরি তোমাকে দিচ্ছি তার নাম এমিলিয়া নয়, এমিলি। এই হল এমিলির জার্নাল। আমার মন খারাপ হলে এই জার্নাল পড়ি আর ভাবি কেন জীবনকে এত ভয়াবহ বলে মনে করবো? সহজ হলেই তো সব সমস্যা ঘুচে যায়।" এমিলির ডাইরি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে প্রশংসা পেতে পারে। সিপা হি বিদ্রোহের সময় ইংরেজ মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন, যেমন মিসেস আর এম কুপল্যাণ্ড (১৮৫৯)। Relief siege and capture ofLukknow নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন ফর্বেস-মিচেল, গুবিন্স, হাচিনসন, ইনেস এবং আরও অনেকে। কিন্তু তিন দুয়ারী ঘর ইতিহাসও নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। আসলে এমিলিকে দরকার সমীরের আত্মোপলব্ধির জন্য— এমিলি আত্মবিসর্জন না দিয়ে, বিরাটের মধ্যে নিশ্চিহ্ন না হয়ে, রিমোর্স আর রিপেনট্যান্সের মধ্য দিয়ে শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমিলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে। এমিলির দৃষ্টিকোণ কতদুর খ্রিষ্টিয়, জানি না। তবে এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গড়ে উঠেছে ইউরোপের সাম্প্রতিক মানবিকতাবাদ।" সমীর এই মানবিকতা অবলম্বনেই হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে — ভালোবাসাই শক্তি— এ কথা এমিলির মধ্য দিয়েই সমীর উপলব্ধি করেছে।

এমিলির জার্নাল বাদ দিলে তিন দুয়ারী ঘরে সাধারণত লোকে যাকে 'গল্প' বলে, তেমন কোন ধারাবাহিক আদি মধ্য অন্ত বিস্তৃত আখ্যান নেই। বেশি অংশ হল সমীরের স্বগতোক্তি— নিজের সঙ্গে কথা বলা— এক সময় উপন্যাসে যাকে বলা হত ইনটেরিয়র মোনোলগ। হয়তো কোন কোন ধারাবাহিক আদি মধ্য অন্তহীন জিজ্ঞাসা আর আর্তিকে 'ইনটেকচুয়াল কসরত' মনে হতে পারে। বেদ উপনিষদ মহাভারত গীতা আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে প্রতীচ্য সাহিত্য শিল্প দর্শনের উদ্ধৃতি বা উল্লেখ। সফোক্লিস।, প্লেটো, হেরাক্লিটাস, এপিকটেটার্স, সেন্ট অগাস্টিন, শেকস্পীয়র, মো, ইয়ুং, রিলকে, এলিয়ট, লরেন্স, ফ্রান্সিস জেমস, মার্ক সেগাল টয়নবি, কার্ল পপার, কামু, জীবনানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গেছে, আত্মপক্ষ সমর্থনে বা বিদ্ধমত খণ্ডনের প্রয়োজনে। 'intellectual feat ' বলতে যা বে ঝায় অনেকটা তাই। কোন সন্দেহ নেই পাঠকের কাছে উপন্যাসের প্রত্যাশা অপরিসীম। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে বিদেশী যে সব লেখকের রচনা বা মতামত পাঁচ কিংবা ছয়ের দশকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যেমন কাম্যু, তাদের উল্লেখ উদ্ধার সেই সময়ের নায়ককে আমাদের কাছে জীবন্ত করে তোলে— "সমীরের ওই ভুতুড়ে স্টেশনে নেমে পড়ার মধ্যে ক ামুর একটা ফেইন্ট রিজেমব্লেনস দেখতে পাচেছা না? আই মিন— ওই আরবটার সঙ্গে এনকাউন্টার।" "কামুর নায়ক আমি নই। যদিও মায়ের মৃত্যুর পরের দিন, অর্থাৎ দাহ করে ফিরে আসার পর যাকে প্রথম দেখেছিলাম তার নাম মীনা সরকার। পার্ক স্ট্রিটে রেস্তোরাঁর সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল সেই তামাটে রঙের মেয়েটি।" কিন্তু সমীরের সমস্যা সমাধানে কবি শিল্পী দার্শনিক কেউ সাহায্য করতে পারেনি। বরং তার বারেবারেই মনে হয়েছে 'ইউরোপের উচ্ছিষ্ট-ভোজী আজকের অ ামাদের জীবনচর্চায় সেই ভারতবর্ষ গাধার ডাকের মতো বিসদৃশ হাস্যকর নয় কি?" আসলে পার্কস্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিটের কলঙ্কিত কাফে—হীরেন প্রণব সীমার নিদ্দেশ বুদ্ধিচর্চা, আত্মপ্রতারণা, শূন্যতা ও নিঃসঙ্গতাবোধের দীর্ঘ সান্নিধ্য সত্ত্বেও সমীর তা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, কারণ "আহত অজগরের মতো আমার অস্তিত্ব সমস্ত গরল নিয়ে আমাকেই দংশ ায়।" শহুরে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের উচচাশা, শিশু সন্তানকে অল্প বয়স থেকে ইংরেজী শিখিয়ে বিলেত পাঠানোর অ াকাঙক্ষা নিয়ে সমীরের বাবা হঠাৎ বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, আর পরিণামে জালিয়াতির দায়ে শাস্তি থেকে বাঁচবার জন্য আত্মহত্যা করেন — এতো প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিরোধে ক্ষত বিক্ষত একালের বাঙালির দর্পণে প্রতিবিম্ব। সমীরের চিন্ত

াধারা বড় 'কনফিউজড', সে জানে "আমার বাঁচার বাস্তব প্যার্টান হল আধা মধ্যযুগীয়। আমার মনের আবহাওয়ার ইউরোপের রঙ।" এই স্ববিরোধের হাত থেকে বাঁচবার উপায় ছোটনাগপুরের পাহাড় মন্ডলীর ভিতরে অপরাজিত আক াশের তলায় শাল মহুয়ার সহোদর হওয়া, ক্সিনীর মতো সহজ সরল পবিত্র প্রেমমূর্তির কাছে আত্মসমর্পণ।

সেইজন্যই বুঝি সমীরকে অন্ধকার রাতে এক ভুতুড়ে স্টেশনে নেমে পড়তে হয় — অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নিয়তির নির্দেশে। জীবনের অর্থহীনতাবোধ — লাইফ ইজ মিনিংলেশ — প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছিন্নতাবোধ — লোনলিনেশ, মাই লোনলিনেশ, ইউ কুডন্ট টাচ্ ইট — অস্তিবাদী চিন্তাভাবনা সমীর ফিরে পেতে চায়। মানুষ তার সীমার গন্ডি জানে না। হীরেন প্রণব মীন া 'উনিশ শতকী শুভবুদ্ধি'কে নিয়ে পরিহাস করে, ইতিহাস চর্চা তাদের কাছে সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি, কমিটমেন্ট। কিন্তু সমীর সেই রাতে স্টেশনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করে, "আজ এই ছোটনাগপুরের পাহাড় প্রাচীরের ধারে মাথার ওপর রোহিনী পুষ্যা অদিতির নীলাভ দ্যুতি রেখে আর সেই গোলকধাঁধায় ফিরতে চাইনা। একই কথার অক্লান্ত পুনরাবৃত্তিতে মুখর কয়েকটি তণ-তণীর পার্ক ষ্ট্রিটের বকুলতলায় আলো-আলো গন্ধে হৃষ্ট কবন্ধ আত্মরতির দুঃসহ শীতলতা আমাকে যেন স্পর্শ করতে না পারে।"

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধা আইভি ব্যারেটের জীবনেও দুঃখ বিপর্যয় শূন্যতা এসেছে। চরিত্রহীন কদর্যরোগে আক্রান্ত স্বামী জন ব্যারেটকে হারিয়েছেন, মেয়ে জামাই তাঁকে প্রতারণা করে তার সামান্য সম্বলটুকু চুরি করে কানাডা পালিয়ে গেছে— অ াজ তিনি শুধু বর্তমানের ছায়ায় অতীতকে নির্মাণ করে চলেন। আন্টি আইভি আদিবাসী খ্রিষ্ট্রান সমাজে তাদের একজন হয়ে বাস করেন— নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয়— তবু পরম প্রত্যয় থেকেই তিনি বলেন, আই অ্যাম নট লোনলি, আই অ্যাম নট লে ানলি।

'তিন দুয়ারী ঘর' উপন্যাসের একটি ভগ্নাংশ আইভি ব্যারেটের কাহিনী। আইভি ব্যারেটকে নিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র উপন্য াস লিখতে পারতেন (যেমন এমিলির জার্নাল নিয়ে)। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার পর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে নিরাপত্তার অভাব, ক্ষোভ জ্বালা যন্ত্রণা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যাওয়ার উন্মাদনা এ সব কিছুই একটি অস ামান্য উপন্যাসের বিষয় হতে পারে। কনিষ্কের অভিজ্ঞতা আর কল্পনা হয়তো খুব কম বাঙালি লেখকেরই আছে। কিন্তু তিনি তো আইভি ব্যারেটের মুখ থেকে শোনা গল্প সেই ভাষায় সেই ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে চাননি। তিনি সমীরকে দিয়ে যান্ত্রিক নিরাসক্তি নিয়ে গল্পটি বলিয়েছেন অথবা বলাতে চেয়েছেন, কিন্তু সমীর জানে "আমি তার মনের কথা বলতে গিয়ে, নিজের মনের কথাই শোনাব। সেই হবে ইতিহাস।" আর সেই ইতিহাস সমীরকে তার অর্থহীন অস্তিত্ব থেকে মুক্তি দেবে, অন্তত তার মুক্তি লাভে সাহায্য করবে।
কনিষ্ক ছদ্মনাম কেন নিয়েছিলেন, জানি না। উপন্যাসের মধ্যে বারবার কবন্ধ মানুষের কথা এসেছে— আমিও দিবালোকে কবন্ধ, হৃষ্ট কবন্ধ ইত্যাদি। মথুরার সেই কনিষ্ক-মূর্তির কথা হয়তো মনে পড়ে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কনিষ্ক দুই ভিন্ন সভ্যতার মিলনসেতু রচনা করেন। একালের কবন্ধ-সভ্যতা কখনও শেষ কথা হতে পারে না। কিন্তু এর সঙ্গে কনিষ্কের কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। তবে সমীর যে ইতিহাসের সন্ধান করে, সেই 'কাল-চেতনা ইতিহাস-চেতনার বিরোধী নয়; বরং পরিপূরক। অনৈতিহাসিক হওয়া কাপুষতা।" আধুনিক সভ্যতা ভারসাম্যহীন, সমীর এর জন্য ইতিহাস চেতনার অভাবকে দায়ী করেছে। তার কাছে ইতিহাস হল সংগতিসাধক জীবনসত্য — "অজস্র বিরোধ, বৈষম্য, বৈপরীত্য, অন্ধ আক্রোশে এগিয়ে যাওয়া; আবার অপার ক্লান্তিতে ঝরে পড়া; বিশৃঙ্খল অণুর মতো আমাদের, ব্যক্তিদের একটা সুষম প্যাটার্নের মধ্যে আনাই যেন সমাজনীতির সাধনা। এই প্যাটার্নটিকে আরও স্পষ্ট করে, তীব্র করে, জীবন্ত করে, অতীত থেকে সযত্নে সংগ্রহ করে বর্তমানে টেনে আনা যেন ইতিহাস। মনে হল মানুষের শ্রম, ধ্যান ও সংগ্রাম এই এক লক্ষ্যে নিয়োজিত। এই হল জীবনের একলব্য সাধনা।"

এর সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রসঙ্গটি কিছুটা প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে। আইভি ব্যারেটের একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা, সমীরের মায়ের

পুজো আর গীতাপাঠে জীবন্ত বিশ্বাস, এমিলির গভীরে 'ডিভাইন গ্রেস'— 'লর্ড আই বিলিভ, হেল্প দাউ মাইন অ নবিলিভ'— একভাবে তাদের উত্তরণ ঘটিয়েছে। ক্সিনীর উত্তরণ তার প্রেমে— জীবনে সেই মূল্যবোধ আরোপ করেছে বলে জীবন তার কাছে জগদ্দল পাথর না হয়ে হয়েছে গোলাপ। সকলেই ইতিহাসের অঙ্গীভুত। আবহমানের কোন একটি নির্দিষ্ট সুর এরা আত্মস্থ করে নিতে চায় দুঃসহ সাধনায়।— "নিজস্ব পরিধির মধ্যে হয়ে ওঠা যেন ওদের সার্থকতা। বিয়িং আর বিকামিং।" সমীরের ঈশ্বর বিশ্বাস নেই, আসলে কোন কিছুতে কোন বিশ্বাস নেই। আর এই অবিশ্বাস, এই সংশয়বুদ্ধি থেকেই অভিমান অহংকার। সমীর সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ, আত্মখণ্ডন তার ললাটলিপি। কখনও তাই তার মনে হয় "আমি জানি আমার বাবা একটা সময়ের দান; যেমন বিশেষ সময়ের মানুষ হল এমিলি, আন্টি, মীনা, আমি। আমরা স্থান ও কালের বাইরে আসতে পারি না। আমরা সীমাবদ্ধ; স্থানে কালে সীমাবদ্ধ।" কিন্তু এমিলি বা আন্টি আইভি স্থানে কালে সীমাবদ্ধ হয়েও একটা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সীমা অতিক্রমে সক্ষম। কিন্তু সমীর বা মীনার অসহায়তা ও যন্ত্রণার কারণ "বিশ্বাস না করে আমরা সুখী নই। বিশ্বাস না করতে পারার জন্য আমাদের সংকট এত তীব্র। বিশ্বাস করতে পারলে বেঁচে যাই। তাই বিশ্বাস হল মেক-বিলিভ। সে আর রক্তাক্ত চৈতন্য নয়"। সমীর এই মনগড়া জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতেই চায়— মেক বিলিভ-এর জগৎ থেকে বিলিফের জগতে উত্তরণের কাহিনী হল তিন দুয়ারী ঘর। এমিলির জার্নালকে প্রক্ষিপ্ত বলেছি, কিন্তু সমীরের বিশ্বাস-অর্জনের ইতিহাসে অপরিহার্য। এমিলি ভালোবাসতে চেয়েছে। নিজেকে ভালোবাসা নয়— একটা স্থিতি স্থিরতা শুভ্রতাকে ভালোবাসা। ক্সিনীর মধ্যে সমীর এই স্থির শুভ্র ভালোবাসাকেই প্রত্যক্ষ করেছে।— "এমন সংযত, সুন্দর, স্বাভাবিক, শ্রীময়, মিতবাক রূপ। দৃষ্টির আলাপ, ভাষার আলাপের চেয়েও অমোঘ। সে চৈতন্যে ছড়িয়ে পড়ে। শিরা উপশিরায় বাজে। এই রূপ হল ক্সিনীর। অনুভূতির গভীরতায়, বোধের ব্যাপ্তিতে, সে যেন আত্মার প্রতিরূপ।" মীনার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত সমীর ক্সিনীকেই আবিষ্কার করেছে। জীবনের দায়িত্ব নিতে হবে, তাই বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তন সম্ভব। আমাদের কোথাও না কোথাও ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। সবাই পথ খুঁজে মরছে। সমীরের অস্থিরতা, যন্ত্রণার স্বরূপ এইভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে— 'চেতনা ক্যানসার' রোগে সে আক্রান্ত।

শেষ পর্যন্ত সেই বদ্ধ যন্ত্রণাময় জীবন থেকে সমীরের নিষ্ক্রমণ— নিসর্গ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে, অপার্থিব প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনবোধের উপলব্ধি— হারানো বিশ্বাসকে ফিরে পাওয়া ছেড়ে আসার দিন সে যেন ফিরে পেয়েছে তার কবচ-কুন্ডল। অপ্রেম থেকে প্রেম, অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস, নন-বিয়িং থেকে বিয়িং — এ এক অলৌকিক উত্তরণ— আমি তোমার কাছে ফিরে যাবো মীনা। এ আমার জীবনের দায়িত্ব, এই আমার টু বী অর নট টু বী-র প্রশ্ন! আমি ইতিহাসের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থান বেছে নেব। এই আমার মুক্তির পথ। ইতি কিংবা নেতির বাঁধা সড়ক নয়। বিপুল স্তব্ধ শূন্যের মধ্যে প্রতি নিমেষে হয়ে উঠে, ফুটে উঠে, রূপান্তরিত হয়ে সাজিয়ে তোলা নিজের জগৎ হল আমার ধ্যান ও কর্ম।

শূন্য থেকে শিকড় বিছিয়ে দিয়েছে শাল গাছ মাটির অমৃত ভৃঙ্গারে। দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে পাতা উড়িয়ে দিয়েছে সে হিরণ্য রোদ্দুরে। ওই-ই তো আবহমানের নচিকেতা। নিষ্ঠুর তাপ নিজে শুষে নিয়ে ওই-ই তো দিল দিব্য প্রসন্নতা, ছায়ার বিস্তার। ওই তো মলিনতা থেকে অমলিন হয়ে ওঠা, নন-বিয়িং থেকে বিয়িং। উপন্যাসের শেষে আন্টি আইভির হাতে আমলকি আর ক্সিনীর হাতে পলাশের গুচ্ছ তুলে দেওয়ার তাৎপর্য মনকে ভরিয়ে দেয়। এমনভাবে জীবনবোধে উত্তরণের সুযোগ নিত্য মেলে না। 'তিন দুয়ারী ঘর' উপন্যাসে কনিষ্ক সেই সুযোগ আমাদের দিয়েছেন আর সেই জন্যই উপন্যাসটিকে তাঁর স্মরণীয় কীর্তি বিবেচনা করি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com